Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-2 Issue-2 January 2024
ISSN 2583-6706 (Online)

খ্যাতনামাদের স্মৃতির ভিটেমাটি তখন এবং এখন

তৃণা মুখার্জী

Link : https://bit.ly/42aeVMM

সারসংক্ষেপ : সমগ্র বিশ্বে এমন কিছু স্থান আছে যেগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিধন্য। একটা সময় সেই মানুষগুলি এখানেই বসবাস করতেন। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অসাধারণ সব ভাবনাগুলিকে প্রকাশ করতেন লেখায়। মানুষ তাঁদের সৃষ্টির রসাস্বাদন করে আনন্দ পেত। ধীরে ধীরে তাঁদের সৃষ্টির মহিমা নিজস্ব গণ্ডি ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় ঘরে ঘরে। তাঁদের সৃষ্টির দৌলতে স্থানগুলি হয়ে ওঠে তীর্থক্ষেত্র। বহুদিন আগে তাঁরা পার্থিব জগৎ থেকে বিদায় নিলেও আজও তাঁদের সৃষ্টি বা ব্যবহৃত জিনিসপত্র ভ্রমণপিপাসু মানুষকে টানে। তারা ছুটে আসে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভিটেমাটি দেখার আশায়। সেগুলি স্পর্শ করতে মন চায়। কিন্তু প্রায়শই হতাশ হতে হয়। দেখার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য হয়। এসে দেখে অধিকাংশ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভিটেমাটি চরম অবহেলায় পড়ে আছে। আর্থিক বা অন্য কারণে পরিবারের বর্তমান সদস্যদের পক্ষে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি সেগুলি সংরক্ষণের বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন চরম উদাসীন। সঠিক প্রচারের অভাবে স্থানীয় বাসিন্দারা জানে না একটা সময় পাঠ্যপুস্তকে পড়া মানুষটি তাদের এলাকার গর্ব ছিলেন। ফলে তারাও এটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। একদিন যা ছিল তীর্থক্ষেত্র আজ সেখানে বিরাজমান শ্মশানের নিস্তব্ধতা। তবে একদল গবেষকের সৌজন্যে বর্তমানে পরিস্থিতির সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। গবেষণার প্রয়োজনে তাদের আগমনের জন্য ধীরে ধীরে জায়গাগুলি তাদের অতীত গরিমা ফিরে পাচ্ছে। অনুপস্থিতির মধ্যেও তাদের স্পর্শ আমরা পাচ্ছি। পূর্ব বর্ধমান জেলায় আছে এমন অনেক খ্যাতনামা বিশিষ্টদের বাড়ি। লেখার প্রয়োজনে তাঁদের ফেলা আসা স্মৃতির মর্মে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছি। গিয়েছি তাঁদের বাড়ি। নানা অভিজ্ঞতায় মোড়া আমার এই লেখা সেই সব হারিয়ে যাওয়া খ্যাতনামাদের উৎসর্গ করলাম।

সূচক শব্দ : সতীপীঠ, কবি, ভিটে, স্মৃতিধন্য, বিশিষ্ট

নরহরি সরকার :

শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের বাসগৃহ : বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করে বাংলায় একাধিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে ছিল বিশ্বাস, মতাদর্শ ও আচরণের পার্থক্য। সেই সময়ে বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার। শ্রীখণ্ড গ্রামটি বৈষ্ণব তীর্থ নামে খ্যাত। চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন নরহরি সরকার। তাঁকে সখী মধুমতীর অবতার বলা হয়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কয়েক বছর আগে তাঁর জন্ম (আবির্ভাব আনুমানিক ১৪৮০/৮১ খ্রিস্টাব্দে আর প্রয়াণ ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে)। তাঁকে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবি বলা যেতে পারে।

নরহরি সরকারের ভজন কুটীর

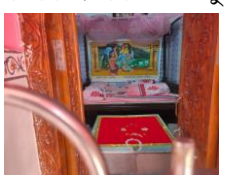

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান।।
খণ্ডের মুকুন্দ দাস শ্রী রঘুনন্দন।
নরহরিদাস মুখ্য এই তিনজন।। (চৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তাঁর পিতা নরনারায়ণ দেব ও মাতা গৌরী দেবী। নরহরি ছিলেন তাঁদের কনিষ্ঠ সন্তান। নরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুকুন্দ। তিনি ছিলেন চিকিৎসক এবং প্রবল চৈতন্য অনুরাগী। মুকুন্দ নরহরিকে পড়াশোনার জন্য নবদ্বীপে পাঠান আর সেখানেই চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর প্রথমবার দেখা হয়। পরে নরহরি শ্রীখণ্ডে ফিরে আসেন। নবদ্বীপে থাকাকালীন চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর সখ্য জন্মায়। চৈতন্যের সংস্পর্শে এসে নরহরি বুঝতে পারেন চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য। চৈতন্যলীলা

বিস্তারের জন্য নরহরি তাঁর শিষ্য লোচনদাসকে 'চৈতন্যমঙ্গাল' কাব্য রচনা করতে বলেন। নরহরি সরকারের আদেশেই লোচন দাস শ্রীখণ্ড গ্রামে বসে 'চৈতন্যমঙ্গাল' কাব্য রচনা করেন।

নরহরি সরকারের ভজন কুটীর

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
গৌর নয়ন তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলার হারা।
গৌর ভজহ গৌর সাধহ
গৌর করহ সার।
গৌর বলিতে জনম যাউক
কিছু না চাহিও আর।
গৌর ভকতি গৌর মুকতি
গৌর বেদের সার।" (নরহরি)

মধু পুষ্করিণী

(মন্দিরের দেওয়ালে লেখা নরহরির কবিতা)

নরহরি সরকার প্রথম ব্যক্তি, যিনি গৌরলীলাত্মক কবিতা রচনা করেন। এছাড়াও 'ভক্তিচন্দ্রিকা পটোল বা পাটল', 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত', 'ভক্তামৃতাষ্টক', 'নামামৃতসমুদ্র', 'গীতচন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

নরহরি বিবাহ করেন নি। তাঁর দাদা মুকুন্দের সন্তান রঘুনন্দনের বংশধরেরা বর্তমানে সেই জায়গায় বাস করছেন। চৈতন্যদেবের আদেশেই মুকুন্দ দাসের বিবাহ হয়। মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দনও ছিলেন কৃষ্ণের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। নরহরি সরকারের প্রতিষ্ঠা করা গৌর মদনমোহন জীউর মন্দির সেখানে রয়েছে। মাঝে আছে নরহরি সরকারের ভজন কুটীর, সঙ্গে অধিষ্ঠিত রাধামোহন রাধা শ্যামরায় মন্দির, এছাড়াও রয়েছেন মদনগোপাল রাধারানী রাধামাধব। এই তিনটি মন্দিরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা অর্চনা করা হয়।

মধু পুষ্করিণী

দক্ষিণেতে নরহরি বামে গদাধর।
শ্রীবাসঅঙ্গানে নাচে গৌরাঙ্গ সুন্দর।।
নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস-বিনোদিয়া।।
গৌর-দেহে শ্যাম-তনু দেখে ভক্তগন।
গদাধর রাধা-রূপ হইলা তখন।
মধুমতি নরহরি হৈলা সেই কালে।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে।। (চৈতন্যমঙ্গাল)

মায়ের কোলে রঘুনন্দন

নরহরি সরকারের মহাসমাধি-তিথি বৈষ্ণবদের একটি ধর্মীয় উৎসব বলা যায়। অঘ্রান মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে মহাসমারোহে দিনটিকে উদ্‌যাপিত করা হয়। এই উৎসবটি প্রবর্তন করেন মুকুন্দের একমাত্র সন্তান রঘুনন্দন। নরহরি সরকারকে ঘিরে রয়েছে অনেক গল্প। শোনা যায়, একবার চৈতন্য ও নিত্যানন্দ শ্রীখণ্ডে গিয়েছিলেন। অনেকটা পথ হাঁটার কারণে তাঁরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নরহরিকে মধু পান করার কথা বলেন। বাড়িতে মধু না থাকায় চিন্তাগ্রস্ত নরহরি তাঁর বাড়ির পেছনের পুকুরে যান। সেখানে গিয়ে নিজ আরাধনা বলে পুকুরের জলকে মধুতে রূপান্তরিত করেন। সেই থেকে সেই পুকুরের নাম 'মধু পুষ্করিণী'। অনেকেই সেই পুষ্করিণীর জলকে পুণ্য জল বলে থাকেন। এই জল পান করলে মধুর স্বাদ পাওয়া যায়। প্রাণে আসে তৃপ্তি। আজও শ্রীখণ্ড গ্রামে সেই পুকুর রয়েছে, সেটিকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আছে একটি ফলক যাতে পুকুরের মাহাত্ম্যের কথা লেখা।

পুকুর সংলগ্ন ফলকের গায়ে লেখা আছে —

কহে নিত্যানন্দ রাম, শুনে মধুমতি নাম
আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি নিকটেতে জল হেরি
সেই জল ভাজনে ভরিয়া।।
আনিয়া ধরিল আগে মধু স্নিগ্ধ মিষ্ট নাগে।
গণ সহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি আনে মধু হয় ততক্ষণে
পুন পুন যাইতে আনন্দ।।

নরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ ছিলেন কৃষ্ণভক্ত ও শ্রীচৈতন্যের প্রতি নিগূঢ় শ্রদ্ধাশীল। তাঁর বিবাহে অনীহা ছিল। কিন্তু নরহরি সরকার বিবাহ না করায় বংশ রক্ষা হবে না জেনে চৈতন্যদেব মুকুন্দকে বিবাহ করার কথা বলেন এবং চৈতন্যদেবের আদেশেই মুকুন্দ বিবাহ করেন। মুকুন্দের একমাত্র সন্তান রঘুনন্দনকে ঘিরে রয়েছে বহু প্রচলিত গল্প। তাঁর মধ্যে একটি হলো — একবার মুকুন্দ বাইরে গিয়েছিলেন কাজের জন্য। কৃষ্ণ মন্দিরের সব দায়িত্ব বালক রঘুনন্দনের ওপর দিয়ে যান। সরল বালক রঘুনন্দন মন্ত্র জানতেন না। কিন্তু তিনি ভগবানকে আপন ভেবে আকুল কণ্ঠে ভোগ নিবেদন করেন এবং ভগবান কৃষ্ণ রঘুনন্দনের এমন আকুল ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করেন। মুকুন্দ এসে দেখেন ভোগ প্রসাদের কিছুটা অংশ থালায় নেই। ছেলে রঘুনন্দনকে প্রশ্ন করলে রঘুনন্দন জানান, ভগবান নিজে এসে ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। এর সত্যতা বিচার করার জন্য পরের দিন মুকুন্দ রঘুনন্দনকে পুনরায় ভোগ দিতে বলেন এবং নিজে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখেন যে, স্বয়ং ভগবান এসে রঘুনন্দনের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন। রঘুনন্দনের সঙ্গে ভগবানের এমন দৃশ্য মুকুন্দকে অবাক করে দেয়। (লোককথা)

রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট তীরে।।
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুকে বারমাসে।
নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ-অবতংসে।।
(চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৫) (দেওয়ালের গায়ে লেখা)

শ্রীখণ্ড গ্রামের দক্ষিণে বড়ডাঙ্গা/বরডাঙ্গা। অতীতে এই জায়গায় ছিল জঙ্গাল। বর্তমানে এখানে নরহরি সরকারের তিরোধান তিথিতে মেলা বসে। প্রত্যেক বছর গৌরবিগ্রহ-সহ গোপীনাথকে বড়ডাঙ্গা/বরডাঙ্গার মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। নাম সংকীর্তন করা হয়। এই সময় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন সেখানে উপস্থিত হন। এখানে আছে গৌর নরহরির বিলাসকুঞ্জ ও পুরনো একটি বিরাট বটগাছ। বড়ডাঙ্গা নামটি এসেছে অনেকগুলি বটগাছ থাকার কারণে। এর পাশেই আছে লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গাল' গ্রন্থ রচনা স্থল। রয়েছে শ্রীরঘুনন্দন ও অভিরাম গোস্বামীর মিলন স্থান। এই জায়গা ঘিরেও রয়েছে অনেক গল্প। জায়গাটি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতি আচ্ছন্ন।

কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম শ্রীখণ্ড গ্রামে। সেখানকার শান্ত পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করেছে। গ্রামটির কোনায় কোনায় অনেক ইতিহাস লুকিয়ে আছে। খ্যাতনামা নরহরি সরকার এখনো বেঁচে আছেন গ্রামবাসীর উজ্জ্বল স্মৃতিতে। আগের থেকে গ্রামটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। খ্যাতনামাদের ভিটেমাটি দেখার জন্য অনেক মানুষই এখানে আসেন। নরহরি প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ মন্দিরে ভোগ গ্রহণ করেন, আরতি দেখেন। মন্দিরগুলিও যথেষ্ট সংরক্ষণে রাখা হয়েছে। মন্দিরের পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম।

বড়ডাঙ্গা মন্দির

শ্রীরঘুনন্দন ও অভিরাম গোস্বামীর মিলনস্থান

লোচনদাসের
চৈতন্যমঙ্গাল
কাব্য রচনার স্থল

লোচনদাস :

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বাড়ির পাশেই মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদকর্তা লোচন দাসের বাড়ি অর্থাৎ তাঁর বাড়িও পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গালকোট সন্নিকট কোগ্রামে। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়, তাঁর আসল নাম ত্রিলোচন দাস। জন্ম-মৃত্যু সাল নিয়ে রয়েছে দ্বিমত। তাঁর বাবার বাড়ি ও মায়ের বাড়ি একই গ্রামে অবস্থিত। তিনি ছিলেন দুই পরিবারের একমাত্র বংশধর। পিতা কমলাকর দাস ও মাতা সদানন্দী। কবি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নরহরি সরকার ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর সহযোগী। তাঁর আদেশেই লোচন দাস লেখেন চৈতন্য জীবনী। তাঁর লেখা গ্রন্থটির নাম 'চৈতন্যমঙ্গাল'। লেখক তাঁর আত্মপরিচয়ে বলেছেন — "বৈদ্য কুলে জন্ম মোর কোগ্রামে নিবাস।। মাতা শুদ্ধমতী সদানন্দী তাঁর নাম। যাঁহার উদরে জন্ম করি কৃষ্ণকাম।। কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা। যাঁহার প্রসাদে গাই গৌরগুন গাথা।।"

'চৈতন্যমঙ্গাল' ছাড়াও লোচনদাস "জগন্নাথ বল্লভের অনুবাদ" ও "দুর্লভসার" এই দুটি গ্রন্থ লেখেন। চৈতন্যমঙ্গাল কাব্যটি তাঁর লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। এই কাব্যের চারটি খণ্ড রয়েছে। যথা সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড। সূত্রখণ্ডের বিষয় — অবতারের স্বরূপ নির্ণয়, আদিখণ্ডে আছে — শ্রীচৈতন্যের গয়া গমন পর্যন্ত বিবরণ। মধ্যখণ্ডে আছে — লীলাচলে বাসুদেব, সার্বভৌমের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন। এবং শেষখণ্ডে আছে — শ্রীচৈতন্যের তীর্থযাত্রার বর্ণনা, পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর অনুগ্রহ, মহাপ্রভুর তিরোধান ইত্যাদি। চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনা করার জন্যই এই গ্রন্থ রচনা করা হয়।

লোচনদাস

লোচনদাসের সমাধি

কোগ্রামের পাশে অবস্থিত অজয় নদী লোচনদাসের স্মৃতি ও বাড়িঘরকে কালের গহ্বরে তলিয়ে নিয়ে গেছে। বর্তমানে তাঁর সমাধি ঘিরে তৈরি হয়েছে মন্দির। সেখানে দৈনিক সেবা চলে। ভক্তরা চাইলে প্রসাদ পান। রয়েছে বড়ো একটি চালা। লোচনদাসের স্মৃতি সংরক্ষণে কবি কুমুদরঞ্জনের ভূমিকা আছে অনেকটাই। বর্ধমান ও বীরভূমের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে অজয় নদী। এই নদীর উপরে তৈরি হয়েছে 'লোচন সেতু' যা বীরভূম ও বর্ধমান জেলাকে আলাদা করেছে।

বেহুলা-লখিন্দর ঘাট :

কথিত আছে, অজয় নদীর বুকে ভেলা ভাসিয়ে সতী বেহুলা স্বামীকে নিয়ে অনন্তের পথে যাত্রা করেছিলেন। এই গ্রামেই নাকি বেহুলার জন্মস্থান। মনসামঙ্গাল কাব্যের প্রধান দুটি চরিত্র বেহুলা ও লক্ষিন্দরের কাহিনি এই গ্রামেরই মর্মে গাঁথা। লখিন্দরকে যখন সাপে কাটে তখন ভেলা ভাসিয়ে বেহুলা এই নদীর ওপর দিয়ে স্বর্গে পাড়ি দিয়েছিলেন। এখনো সাধারণ মানুষ এই ঘাটটিকে বেহুলা ঘাট বলেন। সতী বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে এই ঘাটেই বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সংস্কারের অভাবে ও নদীর পাড় ভাঙায় ঘাটটির বর্তমানে করুণ অবস্থা। এ সব কথা লোকমুখে শোনা যায়।

কিছু বছর আগেও লোচনদাসের বাড়ি ছিল সকলের অন্তরালে। তবে এখন তা সংরক্ষিত। অনেক খ্যাতনামাদের মধ্যে তিনি এখনো জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছতে পারেন নি। আপনারাও চাইলে লোচনদাসের ভিটেমাটি পরিদর্শন করে তাঁর স্মৃতিগুলি নাড়াচাড়া করে দেখতে পারেন।

পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক **:**

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক নাম শুনলেই প্রথমে মনে আসে — 'বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে' — এটি যেন শৈশবের আবেগ। ('আমার বাড়ি', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

পূর্ব বর্ধমান জেলার কোগ্রামে তাঁর বাড়ি। জন্ম ১ মার্চ, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ (১৯ ফাল্গুন, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ)। মৃত্যু ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। কোগ্রামে কবির মামার বাড়ি। তাঁর আসল বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে। কবির বাবার নাম পূর্ণচন্দ্র মল্লিক এবং মায়ের নাম সুরেশ কুমারী দেবী। কবির মাতামহ নবীনকিশোর মজুমদার অপুত্রক ছিলেন। তাই কবি মাতুলালয়ে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে পালিত হন। মল্লিক তাঁদের পরিবারের নবাবী পদবী। আসল পদবী হলো সেনশর্মা বা সেনগুপ্ত। কবিরা হলেন দুই ভাই ও চার বোন। কবি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। মাত্র ১৭ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন শ্রীখণ্ডবাসী সিন্ধুবালা দেবীর সঙ্গে। তাঁদের সাত পুত্র ও তিন কন্যা। তাঁদের নাম — জ্যোৎস্নানাথ, সরিৎনাথ, জগন্নাথ, রেবতীনাথ, পৃথ্বীনাথ, কৌশম্বীনাথ, কণিষ্কনাথ, বাসন্তী, পুলমা ও অঞ্জলি। তাঁর ছেলে কণিষ্কনাথ এক বৎসর বয়সে মারা যান। কবি তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন — তাঁর বাবা পূর্ণচন্দ্রও একজন কবি ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে সেই সব কবিতাগুলি নষ্ট হয়ে যায় বন্যার কারণে। অজয় নদীর বন্যা অনেক কিছুকেই নষ্ট করে দেয়। পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক বর্ধমান জেলার মাথরুণ নবীনচন্দ্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রূপে কর্মজীবন শুরু করেন।

বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ওই বিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্র ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই কবির কবিতা লেখার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। পড়াশোনার পাশাপাশি চলত সাহিত্যচর্চা। তাঁর প্রথম কবিতা 'হেমচন্দ্রের প্রতি' 'নব্যভারত' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তিনি নবম শ্রেণির ছাত্র। তাঁর কবিতার প্রধান অবলম্বন গ্রাম্য জীবন। তাঁর কোগ্রামের বাড়িটি অত্যন্ত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ-বেষ্টিত। গাছপালা দিয়ে ঘেরা এমন পরিবেশ দেখেই বোঝা যায় কবি এত সুন্দর কবিতা রসদ কোথা থেকে পেতেন। গ্রাম্য জীবনের সহজ-সরল-নৈসর্গিক প্রকৃতির ছবি তাঁর লেখায় বারবার ফুটে উঠেছে।

'পল্লীশ্রী' কবিতায় কবি লিখেছেন —

মূর্খ গরিব নামহীন যার মা হয়ে তুই থাকলি মা।
সবদিকে আমি ছোট বলে তুই আগলিয়ে কোলে রাখলি মা।
পাঠাবি কোথায় নাহি সৌরভ তুলিবি কোথায় নাহি গৌরব।
পরে নিলে না তো ঘরে রেখে দিলি তাইতো আমারে পাগলী মা।

অবসর গ্রহণের পর নিজের গ্রামে কাব্যচর্চা, ভাগবত সাধনা ও জন্মভূমি গ্রামের উন্নতি সাধনায় রত হয়েছিলেন। কবি তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন — "আমি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করি তাহা ছোট হইলেও নগণ্য নহে — পুরান ও কাব্যকাহিনী উহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য এই গ্রামেরই ইতিহাস। শ্রীমন্ত সদাগরের বাড়ি এই গ্রামেই। সতী বেহুলা এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করিয়া মিথিলার গৌরবদান করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি লোচন দাসের ইহাই জন্মভূমি — বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয়েরই তীর্থস্থান।"

কুমুদরঞ্জন মল্লিক এই বিদ্যালয়ে পড়াতেন

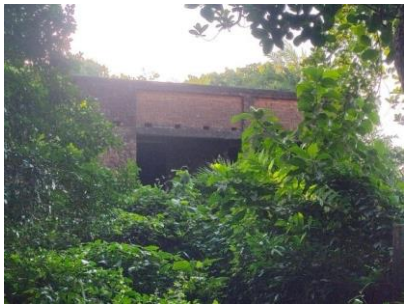

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নির্মিত বিদ্যালয়

শৈশবকাল থেকেই সাহিত্যবেষ্টিত পরিবেশে তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার পাশাপাশি প্রকৃতিপ্রেম কবিকে উচ্চ চিন্তাশক্তির সন্ধান দিয়েছে। গ্রাম্য কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর সাহিত্যে বারবার গ্রাম জীবন, প্রকৃতি, নদীকে স্থান দিয়েছেন। গ্রাম্য জীবনের অতলে প্রবেশ করে তিনি যেন তাঁর আসল মর্মার্থকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর গ্রামের মাটি, গাছপালাও কবিকে স্নেহের বন্ধনে আগলে রেখেছিল। তাই কবির বেশিরভাগ লেখা সেই সব বিষয়ের উপর। তাঁর লেখা কতকগুলি বইয়ের নাম — উজানী (১৯১১), বনতুলসী (১৯১১), শতদল (১৯১১), একতারা (১৯১৪), বনমল্লিকা (১৯১৮), নূপুর (১৯২০), চুন ও কালি (১৯১৬), বীণা (১৯১৬), কাব্যনাট্য দ্বারাবতী (১৯২০), রজনীগন্ধা (১৯২১), অজয় (১৯২৭), তূণীর (১৯২৮), স্বর্ণসন্ধ্যা (১৯৪৮) ইত্যাদি।

আমার উদ্দেশ্য কবির কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করা নয়। আমার লেখার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এমন গ্রাম্য কবিকে সকলের মাঝে আবার জাগ্রত আসনে বসানো। তাঁর ফেলে আসা নানা সৃষ্টিকে সকলের মাঝে নতুন করে তুলে ধরা। তখনকার অবস্থা আর বর্তমান অবস্থার বিচার করা।

আমার বাড়ি থেকে কবির বাড়ি বেশি দূরে নয়। তাই সুযোগ পেলেই মন টানে এমন জায়গায় কিছুটা সময় কাটাতে। এবারও গিয়েছিলাম, তবে এবারের যাওয়া অন্যরকম ছিল। বৃষ্টি হয়েছে কয়েকদিন ধরেই, কবির বাড়ির পাশেই অজয় নদী। বুক ভরা জল নিয়ে সেও এখন প্রবল বেগে ছুটে চলেছে। বাড়ির আশেপাশে গাছপালাগুলো বৃষ্টির জল পেয়ে আরো সতেজ, আরো প্রাণবন্ত হয়েছে। কবির মধু ভবন 'মধুকর' নামটি যথার্থই মানানসই। অজয় নদীর পাশে তাঁর ভবন, সেই জন্য এই নদী হলো কবির প্রেরণা। গাছপালার ফাঁক দিয়ে নদীর ওপারে দেখা যায় গ্রাম। কবিতা লিখতে গেলে যেমন পরিবেশের প্রয়োজন তা তাঁর বাড়ি গেলেই বোঝা যায়। অনেকবার অজয়ের বন্যায় ভেসে গেছে বাড়ি। তবুও নদীকে তিনি ছাড়তে পারেন নি। লিখেছেন—

অজয় আমার ভাঙবে গৃহ হয়তো দুদিন বয়।
তবুও তাহার প্রীতির বাঁধন টুটতে পারি কয়।

কবির বাড়ির পাশেই তাঁর নির্মিত স্কুল আছে, তবে তা এখন ভগ্নপ্রায়। তবুও গ্রামের মানুষের মুখে শোনা যায় তাঁর নানা কাজকর্মের কথা। সেই সময়কার অনেক মানুষই স্কুলটিতে পড়াশোনা করত। কবি নিজেও এই স্কুলের জন্য যথেষ্ট সময় দিতেন। ধুমধাম করে পালিত হতো সরস্বতী পুজো। তবে সারাজীবন গ্রামে কাটানো কবির মৃত্যু গ্রামে হয়নি। তাঁর বড়ো ছেলে জ্যোৎস্নানাথের কলকাতার নবনির্মিত বাড়ির গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে কবি গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। গৃহপ্রবেশের পরের দিন মধ্যমপুত্র ডাক্তার সরিৎনাথের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন।

কবি কুমুদরঞ্জনের কোগ্রামের বাড়িটি আজও গাছপালা আচ্ছন্ন, অজয় নদীর পাশে নিরালায় অবস্থান করছে। করা হয়েছে সংস্কার। ওই গ্রামেই বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের বাড়ি, লোচনদাসের স্মৃতিকে কবি সযত্নে সংরক্ষণ করেছিলেন।

সতীর একান্ন পীঠের মধ্যে একটি পীঠ এই গ্রামে আছে। এখানে সতী মা মঙ্গলচণ্ডী নামে পূজিত হন অর্থাৎ কবির বাড়ির পাশাপাশি গ্রামটি আরো মহিমায় পরিপূর্ণ। বর্তমানে তাঁর বাড়িটি আত্মীয়-স্বজনের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু তাঁরা গ্রামে থাকেন না, বাইরে থাকেন। কবির জন্মদিনে ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাঁরা গ্রামে আসেন। তাঁদের ইচ্ছাতেই কোগ্রামের একটি পরিবার বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করে। তাই হয়তো 'মধুকর' এখনো প্রাণবন্ত হয়ে আছে। প্রথমেই বলেছি কবির আসল বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের শ্রীখণ্ড গ্রামে। সেখানেই তাঁর শ্বশুরবাড়ি।

সতীপীঠ

কবির নাতনি জয়ন্তী মল্লিক

বর্তমানে শ্রীখণ্ড গ্রামে কবির সেজো ছেলে জগন্নাথ মল্লিকের মেজো মেয়ে জয়ন্তী মল্লিক বসবাস করেন। ওই গ্রামে তাঁর বিবাহ হয়েছে। শ্রীখণ্ড গ্রামে যখন গিয়েছিলাম তখন তাঁর মুখেই কবি-সম্পর্কিত নানা তথ্য জানতে পারি। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেন, কবির কাছেই তাঁরা সকল ভাই-বোন মানুষ হয়েছেন। কবি যেহেতু স্কুলে পড়াতেন তাই নাতি-নাতনিদের পড়াশোনাও কবি

নিজের হাতে করাতেন। তখনকার সময়ে কোগ্রাম ছিল দুর্গম জায়গা। যেহেতু বাড়ির সামনেই অজয় নদী এবং বড়ো স্কুল ছিল মঙ্গালকোটে — নদীর অপর পাড়ে, তাই পড়াশোনার অসুবিধার কারণে সকল নাতি-নাতনিদের কবি শ্রীখণ্ডে পাঠিয়ে দেন। তবে সময় পেলেই দাদুর টানে সকলেই কোগ্রামে চলে আসতেন । এইসব কথা বলতে বলতে নাতনি জয়ন্তী মল্লিকের চোখে অশ্রুর ফোঁটা দেখলাম। পুরনো সেইসব ফেলে আসা স্মৃতি আজও বুকে জড়িয়ে বসে আছেন। শ্রীখণ্ডে কবির আদি বাড়ি। বর্তমানে সেই বাড়ি সংরক্ষণের অভাবে এবং নদীর তাণ্ডবে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কবি-নাতনি জয়ন্তী মল্লিক তাঁর বুকের ভিতরে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলিকে সঞ্চয় করে শ্রীখণ্ডে রয়ে গেছেন। শ্রীখণ্ডে যেহেতু কবি ছিলেন না, ছিলেন কোগ্রামে, তাই তাঁর বেশিরভাগ স্মৃতি শ্রীখণ্ডকে কেন্দ্র করে নয়, কোগ্রামকে কেন্দ্র করে।

কখনো যদি কেউ পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গালকোটে আসেন তবে অবশ্যই কুমুদ ভবন পরিদর্শন করে যাবেন। কবি স্মৃতিতে অজয় নদীর উপর তৈরি করা হয়েছে ‘কুমুদ সেতু’। কবির জন্মদিনে উপলক্ষে প্রত্যেক বছর পালিত হয় ‘কুমুদ সাহিত্য মেলা’। খ্যাতনামাদের স্মৃতির ভিটেমাটি আজও আপনাদের অপেক্ষায়।

কত খ্যাতনামা মানুষেরা আছেন যাঁরা আমাদের অজান্তেই বিরাজমান। তাঁদের কথা আমরা শুনি কিন্তু গভীরে যাই না। “খ্যাতনামাদের স্মৃতির ভিটেমাটি তখন এবং এখন” এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমি পূর্ব বর্ধমান জেলার তিনজন খ্যাতনামা ব্যক্তির ভিটেমাটি নিয়ে আলোচনা করলাম। বৈষ্ণব সমসাময়িক কবি নরহরি সরকার, ‘চৈতন্যমঙ্গাল’ কাব্যের রচয়িতা লোচনদাস ও পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক আমার লেখার মূল উপজীব্য। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী হিসাবে তাঁরা আমার কাছে বন্ধুসম। স্বর্ণের চেয়েও মূল্যবান। তাঁদের ফেলে আসা নানা কাহিনি মানুষের জানা দরকার। তাঁদের ভিটেমাটি তাঁদের সেই সমস্ত ফেলে আসা স্মৃতিগুলিকে আজও বহন করে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেকের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, সাহিত্যের ছাত্র হন বা না হন, আপনারা আরো বেশি করে এই সমস্ত মানুষদের ভিটেমাটি দর্শন করতে আসুন, তবেই তাঁরা তাঁদের প্রকৃত মূল্য পাবেন।

অজয় নদ

গ্রন্থ ঋণ :

১। মোহিতলাল মজুমদার, ‘সাহিত্য বিতান’, ২য় সংস্করণ ১৩৫৬, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৬
২। কবিপুত্র জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক রচিত ‘কবি কুমুদরঞ্জন’, ‘সাহিত্যের সীমানা’, ১৯৩৩
৩। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

লেখক পরিচিতি :

তৃণা মুখার্জী : এম.এ. বাংলা (কথাসাহিত্য বিশেষ পত্র)। বি.এড.। বাসন্তী কলা কেন্দ্র নামক গানের স্কুল আছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন। নিজের লেখা বই ‘বাংলা ছোটগল্পে চোর’। ভবিষ্যতে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন।